বসন্তরোগ-চিকিৎসা।

অবতরণিকা।

গানে ও কবিতায়—প্রবন্ধে ও বক্তৃতায় 'সোণার বাঙ্গালা' বলিয়া বাঙ্গালা দেশের গুণ-গরিমা যতই কেন কীর্ত্তন করি না,—প্রকৃতপক্ষে আমাদের দেশের অবস্থা এখন খুবই শোচনীয়। শমনকে শিয়রে করিয়া আমরা শুইয়া আছি। দারিদ্র্য ও মহামারী উদ্যত-মূর্ত্তি লইয়া আমাদের চারি পাশে নিত্য বিরাজ করিতেছে। অতীতের প্রতি ফিরিয়া তাকাইলে দেখা যায় যে, গত বিশ-পঁচিশ বৎসর-কাল ধরিয়া মহামারী নিত্য নানা আকার ধারণ করিয়া আমাদের দেশ হইতে লক্ষ লক্ষ লোক লইয়া গিয়াছে। আর আমরা আমাদের আলস্য ও ঔদাসীন্যকে চাপা দিবার জন্য কতকটা দৈবের দোহাই দিয়া, এবং কতকটা গভর্ণমেণ্টের মুখ চাহিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া আছি। কিন্তু ইহকালের পাপ ও অনাচারের ফল যে হাতে হাতে ভোগ করিতে হয়, এ কথা ভাবিতে ভুলিয়া গিয়াছি। ভিক্টোরিয়ার রাজত্বের প্রারম্ভে প্রথম পাঁচ বৎসর বিলাতে দশ লক্ষ লোকের মধ্যে ৫৭৬ জন

বসন্ত রোগে প্রাণত্যাগ করে। কিন্তু তাঁহারাই রাজত্বের শেষ পাঁচ বৎসর-কাল-মধ্যে ঐ রোগে মাত্র কুড়িজনের মৃত্যু ঘটিতে দেখা যায়। তারপর ওলাউঠায় বিলাতে এক সময় হাজার হাজার লোকের মৃত্যু হইত, কিন্তু বর্ত্তমানে সে রোগ সে দেশ হইতে অদৃশ্য-প্রায় হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহার কারণ কি?—কারণ আর বিশেষ কিছু নহে, আসল কথা, গুপ্ত মারী শত্রুর সহিত লড়াই করিয়া কিরূপে যে আত্মরক্ষা করিতে হয়, সে বিষয়ে সে দেশবাসী মন্ত্রসিদ্ধ আর, আমাদের দেশে যে রোগ একবার প্রবেশ করিতেছে, সে আর নড়িবার নামটি করে না। ঋতু-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে এক একটা ব্যাধি আসিয়া প্রকাণ্ড জাল নিক্ষেপ করিয়া অগণিত মনুষ্য আহরণ করিয়া চলিয়া যায় প্লেগের প্রভাব কমিতে না কমিতে কলেরা মাথা তুলিয়া উঠে। কলেরার পর ম্যালেরিয়া আপন অধিকার বিস্তার করিতে বসে তারপর ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা ও বেরীবেরীর আধিপত্য আরম্ভ হয়। তারপর বসন্তকালে বসন্ত রোগের আগমন। কবি বসন্তকালকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছেন বটে,—"এস বসন্ত, কর জীবন্ত, শীত দুরন্ত,—পীড়িত প্রাণ" কিন্তু বসন্তকাল আসিতেছে মনে হইলেই বাঙ্গালীর বুক ভয়ে কাঁপিয়া উঠে। সারা বসন্ত ঋতুটাই সকলকে সশঙ্কচিত্তে কালযাপন করিতে হয়। নানাপ্রকার পিত্ত শ্লৈষ্মিক রোগকে সহকারী করিয়া স্বয়ং শীতলা এই সময় ধ্বংস লীলায় প্রবৃত্ত হন। কিন্তু এ ধ্বংস-লীলাকে প্রতিরোধ করিবার কি কোনও উপায় নাই?

আমরা কি কেবল রোগ-শোকের শিকার-বস্তু হইবার জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছি?—রোগের কারণ এদেশে আজ নূতন হইয়াছে, এমন তো মনে করি না। আমাদের দেশ চিরদিনই জলা-দেশ বন-জঙ্গল এখনকার চেয়ে পূর্ব্বে বরং বেশীই ছিল। এবং কোনও কালে মশকেরও কিছুমাত্র অভাব ছিল না তবে সেকালেই বা দেশের লোকের স্বাস্থ্য ভাল থাকিত কেন? এবং এখনই বা তাহা থাকে না কেন? বিচারপূর্ব্বক এই 'কেন'র উত্তর খুঁজিতে গেলে কি দেখা যায়?—আমাদের বুদ্ধির ও কৃতকর্ম্মের দোষ নহে কি? যুদ্ধ করিতে গেলে যে সব রসদের দরকার,—সেকালে সর্ব্বপ্রকার গুপ্ত মারী শত্রুর সহিত লড়াই করিবার জন্য সে সব রসদের আমাদের অভাব ছিল না বলা বাহুল্য, আজিও সে সব রসদের অভাব ঘটে নাই তবে তাহার প্রতি আমরা এখন সম্পূর্ণ বিশ্বাস-বিহীন স্বাস্থ্য-রক্ষার জন্য ঋতু পরিবর্ত্তনের সময় তাহার সহিত আপোষ করিয়া চলিবার যে সকল বিধি-ব্যবস্থা আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল, সে সকল এখন আমরা আর মানিয়া চলি না। কিন্তু রোগ-উৎপত্তি ও তাহার বিস্তৃতির কারণ সমূহ আমাদের ঠিকমত জানা থাকিলে, সে সকল বিধি-ব্যবস্থাকে আজ আমরা কুসংস্কার বা বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ মনে করিয়া উপেক্ষার হাসি হাসিয়া উড়াইয়া দিতে পারিতাম না। বসন্ত রোগের কারণ নির্ণয়-প্রসঙ্গে সেই কথাটাই প্রথমে বুঝাইয়া বলিবার চেষ্টা করিব।

বসন্ত রোগের নাম ও কারণ নির্ণয়।

নামটি বড় মিষ্ট—বসন্ত কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা দুরন্ত ও সন্তাপজনক রোগ যদি কিছু থাকে, তবে এই বসন্ত রোগ এই 'বসন্ত' নাম ছাড়া ইহার আরও তিনটি নাম আছে, যথা শীতলা, মসূরিকা ও পাপ-রোগ। এখানে বলিয়া রাখা ভাল যে, এ সমস্ত নাম রোগের কারণ বা লক্ষণ ধরিয়া নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। বসন্তকালে ইহার প্রবল প্রাদুর্ভাব হয় বলিয়া ইহার নাম হইয়াছে—বসন্ত। 'ভাব-প্রকাশে' আছে, শীতলা দেবী কর্তৃক আক্রান্ত যে মসূরিকা তাহাই শীতলা নামে অভিহিত হয়' কিন্তু অনেকের মতে শীতল দ্রব্য সেবন করিলে অনেক সময় এ রোগের উপশম হয় বলিয়া ইহার আর এক নাম—শীতলা। তারপর, তৃতীয় নামটি রোগের আকৃতি অনুযায়ী রাখা হইয়াছে অর্থাৎ, গাত্রে মসূরী ও মুগ প্রভৃতির মত পীড়কার উদ্ভেদ হয়, এইজন্য ইহাকে অনেকে মসূরিকা বলিয়া থাকেন। আর, কুষ্ঠ রোগের ন্যায় পাপজ মনে করিয়া কেহ কেহ ইহাকে 'পাপরোগ' আখ্যা দিয়াছেন। এখন কথা হইতেছে এই যে, এই ভয়াবহ রোগ অন্য সময়ে তেমন প্রবল না হইয়া এই বসন্তকালেই বা এমন রুদ্র মূর্ত্তি ধারণ করে কেন? এখন এই 'কেন'র উত্তরটা দিবারই চেষ্টা করিব।

ঋতু-অনুসারে বৎসর ছয় ভাগে বিভক্ত, এবং কাল-হিসাবে উহা দুই ভাগে বিভক্ত। বৎসরের মধ্যে একটি কালকে বিসর্গ কাল

এবং অন্যটিকে—আদান কাল বলে বিসর্গ শব্দে ত্য · · · এবং আদান শব্দে গ্রহণ বুঝায়। সূর্য্য যে সময়, পৃথিবী হইতে রসাদি গ্রহণ করেন, সেই সময়কে আদান কাল বলে। শিশির, বসন্ত ও গ্রীষ্ম এই তিন ঋতু উত্তরায়ণ—ইহারাই আদান কালের অন্তর্ভুক্ত। আর বাকী তিন ঋতু অর্থাৎ, বর্ষা, শরৎ ও হেমন্ত ইহারা বিসর্গ কাল। এই সময় সূর্য্যদেব দক্ষিণাভিমুখী হইয়া পৃথিবীতে রসাদি বিসর্জ্জন করেন চন্দ্রের বল এ সময়ে অব্যাহত থাকে কাজেই এ সময়টি সোমগুণ প্রধান, আর আদান কালটা আগ্নেয় এ সময়ে বায়ু রুক্ষ ও তীব্র হয়। সুতরাং বসন্তকালে যে আমরা রুক্ষ ও তীব্র বায়ু-সমুদ্রের মধ্যে অবস্থান করিয়া থাকি, তাহা বলাই বাহুল্য।

এইখানে এইটুকু মনে রাখিতে হইবে যে, দেহের উপর বাহ্য প্রকৃতির প্রভাব অত্যন্ত বেশী বহিঃ প্রকৃতির বায়ু, উত্তাপ ও জল দেহের প্রকৃতিকে অনেক পরিমাণেই নিয়মিত করে দেহে যে রস-রক্ত প্রভৃতি সপ্ত ধাতু আছে, তাহারা দেহমধ্যস্থ বায়ু, পিত্ত ও কফ-দ্বারা পরিচালিত হয় বটে, কিন্তু শরীরের ঐ বায়ু, পিত্ত এবং কফও আবার বাহির্জগতের বায়ু উত্তাপ ও জলের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারে না। তাই আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র বলিয়াছেন :—

বর্ষাসু শিশিরে বায়ু গ্রীষ্মে শরদি পৈত্তিকম্
হেমন্তে চ বসন্তে চ শ্লেষ্মকঃ কুপ্যতি ক্রমাৎ

অর্থাৎ, বর্ষা ও শীতকালে বায়ুর প্রকোপ, গ্রীষ্ম ও শরৎকালে পিত্তের প্রকোপ, এবং হেমন্ত ও বসন্ত কালে শ্লেষ্মার প্রকোপ স্বাভাবিক। আয়ুর্বিজ্ঞানে এই প্রকোপকেই রোগ বলে। যদি বায়ু, পিত্ত ও কফ সাম্য অবস্থায় থাকে, তাহা হইলে শরীরও সুস্থ থাকে। এইটুকু রাখিবার চেষ্টাই ব্যাধি-প্রতিষেধের নামান্তর বসন্ত কালে দেহ মধ্যস্থ এই তিনটি পদার্থ কিরূপে বিকৃত হইয়া বসন্ত রোগের সৃষ্টি করে, সেই কথাই এইবারে বলিতেছি।

প্রথমেই বলিয়া রাখা ভাল, শরীরের শোণিত ও পিত্ত বৈগুণ্য প্রাপ্ত হইয়া ত্বককে দূষিত না করিলে বসন্ত রোগ হয় না এখন প্রশ্ন এই যে, এই শোণিত ও পিত্ত এ সময়ে কেমন করিয়া বৈগুণ্য প্রাপ্ত হয়? পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, চরকে আছে কেবল বসন্ত কালে নহে—বৎসরের মধ্যে অপর একটি ঋতু আছে—সে সময়েও শ্লেষ্মা কুপিত হয়। সেটি হেমন্ত কাল এখানে মনে রাখিতে হইবে যে, শ্লেষ্মা উভয় কালেই কুপিত হইলেও কালের বিভিন্নতা হেতু ঐ প্রকোপনের প্রকৃতিও পৃথক প্রকার হয় তন্ত্রান্তরে আছে ঃ—

'হিমে যাতি শমং পিত্তং বায়ু শ্লেষ্মা চ চীয়তে '

অর্থাৎ, হেমন্ত কালে পিত্ত প্রশমিত থাকে, কিন্তু বায়ু ও শ্লেষ্মা সঞ্চিত হয় বলা বাহুল্য, এটা বিসর্গ কাল বলিয়াই ইহারা সঞ্চিত হইয়া থাকে কিন্তু আদান কালের অন্তর্ভুক্ত বসন্ত ঋতুতে তাহা হইতে পারে না। চরক-সংহিতার সূত্রস্থানে স্পষ্টই লিখিত আছে ঃ

'হেমন্তে নিচিতঃ শ্লেষ্মা দিনকৃদ্ ভাভিরীরিতঃ।
কায়াগ্নিং বাধতে রোগাংস্ততঃ প্রকুরুতে বহূন '

অর্থাৎ, হেমন্ত কালের সঞ্চিত শ্লেষ্মা বসন্ত কালীন দিনকর-কিরণে দ্রবীভূত ও পরিচালিত হইয়া কায়াগ্নির বাধা জন্মায়, এবং বহুবিধ রোগ উৎপাদন করে। এখানে একটা কথা উঠিতে পারে যে, শীত ঋতুও যখন আদানকালের অন্তর্ভুক্ত, তখন শীতকালে হেমন্ত কালের সঞ্চিত শ্লেষ্মা দ্রবীভূত না হইয়া বসন্তকালেই ব হয় কেন? কিন্তু আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র অনুসন্ধান করিলে ঐ কথারও উত্তর পাওয়া যায়। সংহিতাকার বলিতেছেন :—

'শৈত্যাৎ শ্লেষ্মা ন কুপ্যতি। শ্লেষ্মঃ কঠিনীভূতঃ।'

অর্থাৎ, শীতের 'শৈত্য বশতঃ শ্লেষ্ম' কুপিত হয় না, কঠিনতা প্রাপ্ত হয়' আসল কথা, শীতকালেও যদি শৈত্যের মাত্রা তেমন কমিয়া যায়, তাহা হইলে শীতকালেই হেমন্তের সঞ্চিত শ্লেষ্মা দ্রবীভূত ও পরিচালিত হইয়া দেহস্থিত অগ্নির বিঘ্ন উৎপাদন করে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, কুপিত শ্লেষ্মাই এ সময়কার রোগের মূল কারণ। এ কথার উত্তরে অনেকে হয়ত বলিতে পারেন যে, শ্লেষ্মাই যদি বসন্তকালীন ব্যাধি সমূহের মূল হেতু হয়, তবে এ সময় বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব হয় কেন? পিত্ত ও শোণিত বৈগুণ্য প্রাপ্ত না হইলে তো বসন্ত রোগের উৎপত্তি হইতে পারে না। একথা অবশ্য সত্য যে শোণিত ও পিত্ত কুপিত না হইলে বসন্ত বা হাম কিছুই হয় না কিন্তু কথা এই যে,

শোণিত এবং পিত্তই বা এ সময়ে বৈগুণ্য প্রাপ্ত হয় কেন ? পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, চরকে আছে, হেমন্তকালের সঞ্চিত শ্লেষ্মা বসন্তকালীন দিনকর কিরণে দ্রবীভূত ও পরিচালিত হইয়া কায়াগ্নির বাধা জন্মায়, এবং বহুবিধ ব্যাধি উৎপাদন করে। বলা বাহুল্য, এই কায়াগ্নি জিনিষটা তেজোময় পিত্তের উষ্মা ছাড়া আর কিছুই নহে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, কুপিত শ্লেষ্মাই পিত্তের কার্য্যে ব্যাঘাত জন্মায়। পিত্তের কাজ কি ? পিত্ত আমাশয় ও পক্কাশয়ের মধ্যে থাকিয়া আহারকে পরিপাক করে, এবং রস, মূত্র ও মলকে পৃথক্ করে। শুধু তাহাই নহে তাহার দ্বারা দেহের আরও একটি প্রধান কার্য্য সাধিত হইয়া থাকে যকৃৎ ও প্লীহাতে অবস্থান করিয়া সে আহার জাত-রসকে রঞ্জিত ক' রক্তাকারে প'রিণ'ত করে কিন্তু বসন্তকালে কুপিত শ্লেষ্মার প্রভাবে পিত্তের সে কার্য্যে ব্যাঘাত ঘটে তাই বায়ুও তখন সাম্য অবস্থায় থাকিতে পারে না কাজেই এ সময়ে ত্রিদোষ ঘটিত ব্যাধিরই বেশী প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাওয়া যায় বসন্ত রোগ যে ত্রিদোষজ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই তবে পিত্ত ও শোণিতের বিকৃতি বেশী রকম না হইলে বসন্ত রোগ উৎপন্ন হইতে পারে না। রোগের মূল কারণ শ্লেষ্মা হইলেও পিত্তই এখানে প্রধান শ্লেষ্মা যতই কন কুপিত হউক না, পিত্তকে যদি এ সময়ে সাম্য রাখিবার চেষ্টা করা যায় তাহা হইলে অন্য ব্যাধি জ'ন্মলেও জন্মিতে পারে, কিন্তু বসন্ত ব হাম হইতে পায় ন অবশ্য, মূলে কুঠরাঘাত করিতে পারিলে, অর্থাৎ শ্লেষ্মাকে ঠিক সোজা 'পে রাখিতে পারিলে

সময়ে ইনফ্লুয়েঞ্জা ও আমাশয় প্রভৃতি কোনও রোগই দেহকে আক্রমণ করিতে পারে না। চরকও তাই বসন্তকালে শ্লেষ্মা প্রকোপ নিবারণার্থে বহুবিধ বিধান দিয়াছেন কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, শ্লেষ্মা কুপিত হওয়া সত্ত্বেও বসন্ত হইতে পায় না, যদি পিত্ত ও শোণিতকে সাম্য অবস্থায় রাখিতে পারা যায় তাই বসন্তাগমে আমাদের ঘরে পিত্ত-নাশক দ্রব্যের আহার-বিধির প্রচলন ছিল, এবং এখনও কেহ কেহ সে বিধি মানিয়া চলেন। আগুণে কখনও আগুণ নিবাইতে পারে না, কিন্তু জলে তাহা পারে দেহে পিত্ত কুপিত হইলেও সেইরূপ পিত্ত-নাশক দ্রব্য দ্বারা তাহা শান্ত করিতে হয় এই জন্য বসন্তাগমে নিমপাতা, উচ্ছে প্রভৃতি তিক্ত দ্রব্য আহার করা যুক্তিসঙ্গত এবং শিম, কলাই ডাল ও যে-সে শাক এ সময়ে খাইতে নাই পূর্ব্বে এ সকল নিয়ম আমরা মানিয়া চলিতাম, কিন্তু এখন গোরার হাতের পঞ্চগব্য নহিলে কিছুই শুদ্ধ হয় না বলিয়া ঐ সকল নিয়ম বড় মানিয়া চলি না।

সংক্রামক বিষ ও টিকা সম্বন্ধে আলোচনা।

বসন্তরোগ যে সংক্রামক ব্যাধি, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে অনেকে মনে করেন যে, সংক্রামক বিষই এ রোগের প্রধান বা একমাত্র কারণ, তাহা ঠিক নহে যদি সংক্রামক বিষই এই রোগোৎপত্তির একমাত্র কারণ হইত, তাহা হইলে রোগীর শুশ্রূষাকারীকে উহা অবশ্যই আক্রমণ করিত। কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই তাহার ব্যতিক্রম

ঘটে। বরং দেখা যায় যে, যেখানে ঐ রোগোৎপত্তির কোনও সম্ভাবনা কেহ মনে করে নাই, সেইখানেই সহসা উহার আবির্ভাব ঘটিয়াছে। আমাদের আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রও সংক্রামক বিষকে কেবল এ ক্ষেত্রে নহে কোনও ক্ষেত্রেই প্রাধান্য দেন নাই। আয়ুর্ব্বেদ বলেন, দেহে যদি সে রকম রোগোৎপত্তির নিদান সকল নিষেবিত হয়, তাহা হইলে বিনা সংক্রমণেও রোগোৎপত্তি ঘটিবে। আসল কথাও তাই. তুমি যদি রোগের নিদান সকল পরিহার করিয়া চলিতে পার, তাহা হইলে কোনও সংক্রামক ব্যাধির বিষই তোমার দেহে সঞ্চারিত হইতে পারিবে না। লৌহ বা পাষাণের উপর বীজ রাখিলে যেমন তাহা হইতে কখনও অঙ্কুরোদগম হয় না, তেমনই নির্দ্দোষ শরীরেও রোগের বিষ বা বীজাণু শিকড় গাড়িতে পারে না। তবে রোগ নিদানের ময়লা মাটি দেহ-মধ্যে কিছু জমিলে সংক্রামক ব্যাধির বিষ বা বীজাণুকে ভয় করিবার কথা বটে কারণ এইরূপ দূষিত দেহই ঐ বিষের বিকাশ ও বিস্তার-লাভের উপযুক্ত ক্ষেত্র এইজন্য বাগ্‌ভট স্পষ্টই বলিয়াছেন,—'সঞ্চয়কালেই বাতাদি দোষকে জয় করিবে। প্রকোপন কাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবে না। দোষ সকল প্রথমেই ছিন্নমূল হইলে আর বিকার উৎপাদন করিতে পারে না ' এখানে বলিয়া রাখা ভাল যে, ঐ দোষ সকলকে ছিন্নমূল করিবার শক্তি টিকার নাই। পিত্ত ও শোণিত-দুষ্ট-দেহে টিকা লইলে বসন্তের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া দূরে যাউক, বসন্তকে বরং অনেক সময় ডাকিয়া আনাই হয়। এই-

জন্য টিকার উপর আমাদের তেমন বিশ্বাস নাই। পরন্তু দেখিয়াছি যে, আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ বহুকালের পরীক্ষার দ্বারা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া বসন্তরোগের প্রতিষেধক-হিসাবে যে সকল বিধি নিষেধের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন. তাহার ফল অমোঘ ও অতুল্য। ঐ সকল বিধি নিষেধের ব্যবস্থাকে বিচার বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, সঞ্চয়কালে বাতাদি দোষকে জয় করিবার ও দুষ্য রক্ত পিত্ত প্রভৃতিকে বিশুদ্ধ অবস্থায় আনিবার উপায় ছাড়া উহারা আর কিছুই নহে। প্রসঙ্গক্রমে এস্থলে আমরা প্রধান কয়েকটি প্রতিষেধক বিধির উল্লেখ করিতেছি।

প্রতিষেধক-বিধি।

১। উচ্ছে ও উচ্ছের বীচি, পলতা, নিম্ব পাতা, ব্রাহ্মী শাক, নালিতা (তিক্ত পাট পাতা) ও বকপুষ্প প্রভৃতির মধ্যে যে কোনও একটি দ্রব্য ঘৃত-সৈন্ধব সংযোগে নিত্য ভাজিয়া খাওয়া উচিত।

২। যে দ্রব্য আহার করিলে অম্ল উদ্গার উঠে, পিপাসা ও বুকের জ্বালা উপস্থিত হয়, এবং বিলম্বে পরিপাক হয়, তাহা খাইতে নাই। দুর্গন্ধ ■ বর্ণান্তরিত অন্নও খাইতে নাই ইহা ছাড়া, মৎস্য, মাংস, লঙ্কা, পেঁয়াজ, সাচিক্ষার (সোডা), শিম, শাক ও মাষকলাই প্রভৃতি বেশী খাওয়া উচিত নহে।

৩। কণ্টিকারীর শিকড়ের ছাল চারি আনা ওজন এবং একুশটি গোলমরিচ একত্র বাটিয়া প্রাতঃকালে সেবন করিতে হয়। ইহা পূর্ণ মাত্রা। যাহাদিগের বয়স একুশ বৎসরের চেয়ে কম তাহারা নিজেদের যত বয়স, সেই কয়টি গোলমরিচ সহ উহা সেবন করিবে। ১৩ ১৪ বৎসরের বালকগণ অর্দ্ধমাত্রা এবং ৫ ৬ বৎসরের শিশুগণ সিকি মাত্রা সেবন করিবে বৎসরে ইহা একবার মাত্র সেবন করিলেই উপকার পাওয়া যায় ইহা পরীক্ষিত।

৪ ৪ ৫টা শিমুলের বীজ অর্দ্ধ তোলা কাশীর চিনি-সহ প্রাতে দুইদিন মাত্র সেবন করিলে বসন্তরোগ আক্রমণের ভয় থাকে না।

৫। তেলাকুচা, মাধবী লতা অশোক ছাল, অশ্বথ ছাল ও বেতস পাতা এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকটি সাড়ে ছয় আনা ওজনে লইয়া, আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া, আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া এক রাত্রি বাসি করিয়া পরদিন প্রাতঃকালে সেব্য বসন্তরোগের প্রাদুর্ভাব সময়ে ইহা সপ্তাহে একদিন করিয়া সেবন করিলেই উপকার পাওয়া যায় ইহাও পরীক্ষিত।

৬। নিমপাতা, কাঁচা হলুদ ও রুদ্রাক্ষ সমাংশে লইয়া সর্ব্বশুদ্ধ অর্দ্ধ তোলা হইলে, উহা শীতল জলে পেষণ করিয়া একদিন মাত্র সেবন করিলে সে বৎসরে বসন্তরোগের ভয় থাকে না (পরীক্ষিত)

৭ মোচার রস, শ্বেত চন্দন, বাসকের রস ও কিঞ্চিৎ মধুসহ চারি আনা আন্দাজ যষ্টিমধু চূর্ণ সেবন করিলে বসন্তের আক্রমণ-ভয় নিবারণ হয়।

৮। হরিতকীর বীজ পুরুষের দক্ষিণ অঙ্গে ও স্ত্রীলোকের বাম অঙ্গে ধারণ করিলে বসন্ত হয় না

৯। অনেকের মতে রুদ্রাক্ষ ধারণেও বসন্তের ভয় নিবারণ হয়।

১০। ভেলার আঠার টিকা লইলে বসন্ত হয় না। অর্থাৎ, বুকে কড়া হইলে অনেকে যেমন সেই স্থানে চিতার আঠা লাগাইয়া একটু ঘা করেন, এবং তাহাতে বড়া ভাল হইয়া যায়, এ ক্ষেত্রেও তেমনই হাতের কোনও এক স্থানে বা কপালে ভেলার আঠা লাগাইলে একটু ঘায়ের মতন হয় বটে, কিন্তু শীঘ্রই তাহা শুকাইয়া যায়, এবং তাহার ফলে বসন্তরোগের ভয় থাকে না ভেলার মজ্জা বায়ু, পিত্ত, কুষ্ঠ ও ব্রণনাশক বলিয়া বিখ্যাত। শীতকালে প্রত্যহ প্রাতে কিছুদিন ধরিয়া আধ তোলা আন্দাজ ভেলার ঘি একটু গরম দুধে গুলিয়া খাইতে পারিলে শুধু বসন্ত নহে খোস, চুলকণা ও পাঁচড়া প্রভৃতি কোনও রক্তদুষ্টি রোগেরই ভয় থাকে না। রসায়ন-হিসাবেও ইহা এক শ্রেষ্ঠ ঔষধ। এই ঔষধটি আমাদের বহু পরীক্ষিত।

১১। চৈত্র মাসের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী তিথিতে একটি মাটির কলসীতে চূণ মাখাইয়া, তাহার ভিতর মাটি পুরিয়া তাহাতে একটি মনসা-কাঁটার গাছ পুঁতিয়া, সেই গাছে রক্তবর্ণ পতাকা উড়াইয়া বাড়ীতে রাখিলে বসন্তের ভয় দূর হয়

১২। কেহ কেহ বলেন, ডাবের জলে আতপ চাউলের ভাত রাঁধিয়া এক সপ্তাহকাল নিত্য আহার করিলে বসন্তের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

আয়ুর্ব্বেদে বসন্ত রোগের কথা।

চরক-সংহিতার কোনও স্থানে বসন্ত রোগের নাম-গন্ধ না থাকিলেও উহার 'বিসর্প চিকিৎসা-অধ্যায়' পড়িতে গেলে কিন্তু ঐ রোগটার কথাই মনে পড়িয়া যায় হারীত সংহিতায় 'বসন্ত' 'মসূরিকা' এই দুইটা নামেরই উল্লেখ আছে হারীত বিসর্প রোগের কথা শেষ করিয়া উপসর্গ নামে যে এক রোগের কথা বলিয়াছেন, তাহারই প্রকার ভেদ হিসাবে 'বসন্ত' ও 'মসূরিকা'র তিনি নাম করিয়াছেন রোগের নাম হিসাবে এই উপসর্গ কথাটি আর কোনও আয়ুর্ব্বেদ-গ্রন্থে ব্যবহৃত হইতে দেখি নাই সুশ্রুত বিসর্প রোগ-অধিকারে বসন্তের নাম করেন নাই বটে, তবে 'ক্ষুদ্র রোগ চিকিৎসার' কথা বলিতে গিয়া মসূরিকার তিনি নাম করিয়াছেন, এবং সেই প্রসঙ্গে কুষ্ঠ ও বিসর্পের উল্লেখ না করিয়াও থাকিতে পারেন নাই সুশ্রুত স্পষ্টই লিখিয়াছেন, "মসূরিকায় কুষ্ঠয় প্রলেপাদি ক্রিয়া, অথবা পিত্ত-শ্লেষ্ম-বিসর্পোক্ত ক্রিয়া প্রশস্ত "— তারপর, চক্রদত্ত, ভাবপ্রকাশ ও নিদান-গ্রন্থে বসন্ত রোগের স্বতন্ত্র অধ্যায় দেখিতে পাওয়া যায়, এবং ঐ কয়খানি গ্রন্থে বিসর্পাদি রোগের পরই বসন্ত রোগের অবতারণা করা হইয়াছে এই সব দেখিয়া শুনিয়া মনে হয়, আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রকারগণ বসন্ত-রোগকে বিসর্প-রোগের সহিত ঘনিষ্ঠ-সম্বন্ধ-সূত্রে বাঁধিতে চাহেন আমরাও ইহা অযৌক্তিক বলিয়া মনে করি না বিসর্প-রোগ-সম্বন্ধে চরক

বলিয়াছেন,—"এই রোগ বিবিধপ্রকারে বিসর্পিত হয় বলিয়া উহার নাম বিসর্প; এবং শরীরের সর্ব্বত্র সর্পণ করে বলিয়া পরীসর্প নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। রক্ত, লসীক (ত্বক ■ মাংস মধ্যস্থ রস বিশেষ), ত্বক ও মাংস এই চারিটি দূষ্য এবং বায়ু, পিত্ত ও কফ এই তিনটি দোষ এই সাতটি ধাতু বিসর্প রোগের উপাদান" - এদিকে দেখা যায়, বসন্তও বিসর্পের ন্যায় শরীরের সর্ব্বত্র সর্পণ করে, এবং বিসর্পের যে সমস্ত উপাদান প্রায় সে সমস্ত উপাদানই বসন্ত রোগেরও আছে; উপরন্ত মেদ, মজ্জা, অস্থি ও শুক্রকেও উহার উপাদান বলিয়া ধরা হইয়াছে বিশেষতঃ প্রবল রক্ত পিত্ত সমন্বিত দোষ যে ঐ উভয় রোগোৎপত্তিরই প্রধান কারণ, তাহা ঐ দুইটা রোগের আকৃতি ও প্রকৃতি দেখিয়া বেশ বুঝা যায় সেই জন্যই বোধ হয়, সুশ্রুত বলিয়াছেন "মসূরিকায় পিত্ত-শ্লৈষ্মিক বিসর্পের ক্রিয়া প্রশস্ত।' সুতরাং বসন্তকে বিসর্প রোগের অনেকটা সমজাতীয় বলিলে বোধ করি অসঙ্গত হয় না।

বসন্তের পূর্ব্বাবস্থা।

এইবার বসন্ত রোগের পূর্ব্বরূপের কথা বলিব। শরীরে বসন্ত প্রকাশ হইবার দুই তিন দিন পূর্ব্বে প্রবল জ্বর হয়, এবং সেই সঙ্গে অরুচি, অগ্নিমান্দ্য, মাথাভার ও ঘাড়ে পিঠে বিষম বেদনা দেখা দেয়। ইহা ছাড়া, আর কোনও লক্ষণ যে বসন্তের পূর্ব্বে হয় না, তাহা নহে। চক্ষুজ্বালা মাথা-ধরা, কম্প, দাহ, শীতবোধ, অবসাদ,

ভ্রম, চিত্তের অস্থিরতা, স্বপ্নে বিভীষিকা-দর্শন, পিপাসা, বমনের বেগ, গলার নাড়ী দপ্ দপ্ করা, জিভ সাদা ও চট্‌চটে হওয়া এবং চোখ ছুটি লাল হইয়া উঠা প্রভৃতিও বসন্ত রোগের পূর্ব্ব লক্ষণ। তবে ইহারা [redacted] বা ঘাড়ে পিঠে বেদনায় ন্যায় অনিবার্য্য লক্ষণ নহে। বসন্তের প্রকার-ভেদ-হিসাবে ইহাদেরও প্রকাশ-ভেদ ঘটে। অর্থাৎ, জ্বরের সময় বাতাদি দোস ও রক্তাদি দুষ্য-পদার্থের বলাবল-অনুযায়ী ঐ সকল লক্ষণেরও কতক প্রকাশ পায় ও কতক প্রকাশ পায় না।

তারপর, দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিনে [redacted] সহসা খুব কমিয়া যায়, এবং সেই সঙ্গে শরীর ঈষৎ বিবর্ণ ও সামান্য স্ফীত হয় এই সময়ে রোগীর গায়ে হাত দিয়া একটু টিপিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, চামড়ার নীচে যেন একটু শক্ত ও ছোট ছোট গুটি জন্মিয়াছে। তবে যে ক্ষেত্রে হাম বা সামান্য ভাবে পানি বসন্ত হইবার সম্ভাবনা, সে ক্ষেত্রে রোগীর গায়ে হাত দিলে বিশেষ কিছু বুঝা যায় না।

দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিনে [redacted] কমিলে শরীরের যে ত্বক একটু স্ফীত ও বিবর্ণ হয় বলিয়াছি, এখানে মনে রাখিতে হইবে, ত্বকের ঐ বিবর্ণতা এক রকমের হয় ন দোষ ভেদে বিবর্ণতারও রূপ-ভেদ হইয়া থাকে। স্ফীত চর্ম্ম যখন অরুণ বা কৃষ্ণবর্ণ হইয়া কর্কশ ও সূচ-বিদ্ধবৎ বেদনাযুক্ত হয়, তখন বুঝিতে হইবে যে ইহা বাতজ। শোথযুক্ত চর্ম্ম যদি পীত বা রক্তবর্ণ হইয়া পার্শ্বস্থিত অগ্নি-সন্তাপের জ্বালা অনুভব করে, তাহা হইলে মনে করিতে হইবে যে, ইহা

পিত্তজ। যে স্ফীত ত্বক পাণ্ডু বা শুক্ল বর্ণ হইয়া শীতল, কঠিন ও কণ্ডুযুক্ত হয়, তাহা শ্লেষ্মজ জানিতে হইবে। চর্ম্ম যদি অত্যন্ত কৃষ্ণবর্ণ হয় ও সেই সঙ্গে শরীরের ভিতর অত্যন্ত জ্বালা অনুভূত হয়, তাহা হইলে উহা রক্তজের লক্ষণ বুঝিতে হইবে।

আমাবস্থা

বসন্তের পূর্ব্বাবস্থায় শোথযুক্ত ত্বকের বিবর্ণতা সম্বন্ধে যাহা উল্লেখ করিয়াছি, তাহা বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না অর কমিবার কালে উহা লক্ষিত হয়, এবং অর-মগ্ন হইলেই বসন্ত-স্ফোটক বাহির হইতে থাকে পীড়কাগুলি বিবর্ণ গাত্র-চর্ম্মের সমান বর্ণ-বিশিষ্ট, স্বতন্ত্র ও ক্ষুদ্র আকারে দেখা দেয় প্রথমে মুখেই বেশী রকম বাহির হয়। পরে গলা, বুক, পিঠ, হাত ও কাঁধে প্রকাশ পায় তারপর, দুই-তিন দিনের মধ্যে নিম্ন অঙ্গে ছড়াইয়া পড়ে এই সময়ে মাথার যাতনা ও ঘাড়ের বেদনা অনেকটা কমিয়া যায় শোথ-স্থানও অপেক্ষাকৃত শীতল হয়, এবং শোথ একটু কমিয়া আসে। এ অবস্থাকে বসন্তের আমাবস্থা অর্থাৎ অপকাবস্থা বলে দুই তিন দিনের বেশী এ অবস্থা বড় স্থায়ী হয় না অন্য সকল ব্রণের ন্যায় বসন্তের পীড়কাও এ অবস্থার পর পচ্যমান অবস্থায় এবং তাহার পরে পক্বাবস্থায় পরিণত হয় যদিও বাতাদি দোষ-ভেদে,—রস রক্তাদি ধাতুর আশ্রয়-ভেদে বসন্ত নানা প্রকার হয়, কিন্তু উহার ক্রম-পরিণত অবস্থার প্রতি প্রধানতঃ লক্ষ্য রাখিয়া চিকিৎসা করা উচিত

কারণ, এ রোগের পূর্ব্বাবস্থা ও আমাবস্থা দেখিয়া উহা কোন্ ধাতুকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পাইবে, তাহা তেমন বুঝিতে পারা যায় না আমাদের বিবেচনায়, বসন্ত রোগের গোড়ায়— অর্থাৎ, ইহার পূর্ব্বাবস্থা ও আমাবস্থার সময় একটু বিচার করিয়া ঔষধাদি প্রয়োগ করিতে পারিলে এ রোগ মেদ-মজ্জা প্রভৃতি ধাতুকে আশ্রয় করিয়া তেমন ভীষণ আকার ধরিতে পারে না। পূর্ব্বে বলিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি যে, পিত্ত, শ্লেষ্মা ও শোণিত এই তিনটী জিনিষ না বিগড়াইলে বসন্ত রোগ উৎপন্ন হয় না। বায়ুর প্রকোপ এ ক্ষেত্রে অল্প বিস্তর দৃষ্ট হইলেও উহা কতকটা যোগবাহীরূপে কার্য্য করে। অর্থাৎ উহা পিত্তের সহিত সংযুক্ত হইয়া দাহাদি এবং শ্লেষ্মার সহিত সংযুক্ত শীতলতা প্রভৃতি উৎপাদন করে সুতরাং পিত্ত শ্লেষ্মাকে গোড়া হইতে দমনে রাখিবার চেষ্টা করিলে বায়ু একা এ ক্ষেত্রে বড় কিছু করিতে পারে না।

পচ্যমান অবস্থা।

এই সময় বসন্ত বড় হইয়া পাকিতে আরম্ভ করে। পূঁষ খুব গাঢ় হয় ব্রণের চতুর্দ্দিকের চর্ম্ম ঘোর লাল হইয়া উঠে, অতিশয় বেদনাযুক্ত ও স্ফীত হয় গুটী সকলের ভিতর নানা রকম যন্ত্রণা বোধ হয়। কখনও মনে হয়, পিপীলিকা দংশন করিতেছে, কখনও বা মনে হয়, পিপীলিকা চলিয়া বেড়াইতেছে, এবং কখনও বা বোধ হয়, কেহ যেন ভিতরে ছুরি চালাইতেছে। চোখ, কাণ, গলা ও

মুখ প্রভৃতির ভিতরেও বসন্তোদ্ভেদ হয়। মুখের ভিতর হইলে সব [illegible] লাল পড়িতে থাকে, গলার মধ্যে হইলে কিছু গিলিতে পারা যায় না। নিশ্বাস পথ সমূহে হইলে স্বরভঙ্গ হয়, কাস হয় এবং অনেক সময়ে থুতু বা শ্লেষ্মার সঙ্গে [illegible] ও পিত্ত উঠিতে দেখা যায় চোখের পাতায় ও চোখের ভিতর হইলে জ্বালা হয়, ও চোখ দিয় জল পড়িতে থাকে, এবং চোখে আলো সহ্য হয় না শোওয়া ব বসা কিছুতেই রোগী সোয়াস্তি পায় না। দাহ ও পিপাসা বাড়ে কিছু খাইতে ইচ্ছা করে না। গায়ে একপ্রকার গন্ধ বাহির হয় জ্বরও এ সময়ে আবার দেখা দেয়।

বসন্ত রোগে সাধারণতঃ দুইবার জ্বর হয় প্রথমবারের জ্বর, অর্থাৎ বসন্ত বাহির হইবার পূর্ব্বে যে জ্বর হয়, তাহা অত্যন্ত প্রবলভাবে দেখা দিলেও তাহাতে প্রাণ হানির [illegible] থাকে না। গুটীকা ফুটিতে আরম্ভ করিলেই সে জ্বর আপনা হইতে সারিয়া যায়। কিন্তু এই পচ্যমান অবস্থার সময় যে জ্বর হয়, তাহা তেমন প্রবল আকারে দেখা না দিলেও উহার সঙ্গে যদি তৃষ্ণা, দাহ, বমন, অতিসার, প্রলাপ ও রক্ত-বমন প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত হয়, তাহা হইলে রোগ মারাত্মক হইয়া উঠে। মৃত্যু ঘটিবার হইলে এই সময়েই সচরাচর তাহা ঘটে। পূঁয অতিরিক্ত [illegible] বসন্ত খুব বেশী বাহির হইলে রোগ কঠিন বুঝিতে হইবে। মৃত্যুর পূর্ব্বে শ্লেষ্মাই প্রবল হয়। রোগের সাত আট দিন না কাটিলে মৃত্যু প্রায় ঘটে না। এই পচ্যমান অবস্থা কাটিলে পরে পক্কাবস্থা আরম্ভ হয়। এইবার তাহারই কথা বলিব।

পক্কাবস্থা।

এই সময়ে রোগীর সকল রকম যন্ত্রণা কমিতে আরম্ভ করে। পুঁযপূর্ণ ব্রণ সকল পাণ্ডুবর্ণ হয়। শোথের আকারও পূর্ব্বের ন্যায় উন্নত থাকে না। অনেক সময় বসন্ত ফাটিয়া পুঁয বাহির হয়, আবার অনেক সময় উহা গালিয়া দিতে হয়। পুঁয বাহির হইয়া গেলে শরীর হাল্কা বোধ হয়। খোসের পুঁয বাহির হইয়া যেমন খোসের গায়ে জমাট বাঁধে, বসন্তের পুঁযও তেমনি বসন্তের গায়ে জমাট বাঁধিতে থাকে। তিন চারি দিন পরে উহা শুকাইয়া ঝরিয়া পড়িতে আরম্ভ করে। তখন ব্রণের ভিতরের পরিষ্কার সামান্য রাঙা হয়। এই [illegible] চুলকানিও হয়। চুলকানির সময় অসাবধানে চুলকাইলে ক্ষত-চিহ্ন সহজে মিলায় না। এ সময়ে রোগীর আহারে প্রবৃত্তি জন্মে।

একে একে বসন্তের চারি রকম অবস্থার কথাই বিবৃত করিলাম। নিদান ও ভাবপ্রকাশ দোষ ও দূষ্য পদার্থের প্রকোপ-হিসাবে বসন্তের প্রকারভেদ নির্দেশ করিয়া উহাদের লক্ষণগুলি বলিয়া গিয়াছেন। ঐ সকল লক্ষণের মধ্যে কোন্‌টা আমাবস্থার লক্ষণ, কোন্‌টা পচ্যমানাবস্থার লক্ষণ, আর কোন্‌টাই বা পক্কাবস্থার লক্ষণ, তাহা নিদান বা ভাব-প্রকাশ স্পষ্ট করিয়া বড় একটা কোথাও বলেন নাই। সমগ্র রোগ-ভোগের মধ্যে অবশ্য এক অখণ্ড যোগসূত্র বর্ত্তমান আছে। তবে লোকে যেমন অখণ্ড মহাকালকে খণ্ড খণ্ড করিয়া

লইয়া তাহারই এক অংশকে অতীত, এক অংশকে বর্ত্তমান, ও আর এক অংশকে ভবিষ্যৎ বলে, আমরাও তেমনি এই রোগের ভোগ-কালকে অবস্থা-পরিবর্ত্তনের হিসাবে একটিকে পূর্ব্বাবস্থা, একটিকে আমাবস্থা, একটিকে পচ্যমানাবস্থা ও আর একটিকে পক্বাবস্থা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি। চিকিৎসার পক্ষে সুবিধা হইবে বলিয়াই আমরা এইরূপ করিয়াছি। শাস্ত্রোক্ত যত প্রকার বসন্ত আছে, তাহাদের নাম ও সেই সঙ্গে তাহাদের লক্ষণগুলির এইবার উল্লেখ করিব উহার সহিত আমাদের উল্লিখিত বসন্ত-রোগের অবস্থা ভেদের লক্ষণগুলি মিলাইয়া দেখিলে শুধু রোগের অবস্থা-নির্ণয় নহে,—রোগ-চিকিৎসার ব্যবস্থা নির্দ্ধারণ করাও অনেকটা সহজসাধ্য হইবে

প্রকার-ভেদ।

বাতজ বসন্ত ঃ ইহাতে গুটী সকল কৃষ্ণ বা অরুণ বর্ণ, রুক্ষ, তীব্র বেদনাযুক্ত ও কঠিন হয় ইহা বিলম্বে পাকে স্রাব অল্প হয়। ইহাতে সন্ধি, অস্থি ও পৃষ্ঠস্থানে বিদারণবৎ বেদনা, কাস, কম্প, চিত্ত-চাঞ্চল্য, ভ্রম, তালু ওষ্ঠ ও জিহ্বার শোষ, তৃষ্ণা ও অরুচি এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

পিত্তজ বসন্ত ঃ—ইহার গুটীগুলি রক্ত, পীত, নীল, কপিল ও শ্যামবর্ণ হয়। ব্রণে জ্বালা ও বেদনা দুইই থাকে। ইহা শীঘ্র পাকিয়া উঠে। ইহাতে মুখে ঘা, চক্ষু দুইটি রক্তবর্ণ, প্রবল জ্বর, পাতলা দাস্ত, তৃষ্ণা ও অরুচি হয়।

শ্লৈষ্মজ বসন্ত ঃ—ইহার পিড়কা সকল পাণ্ডু বা শ্বেতবর্ণ, চিক্কণ, অধিক স্থূল, শীতল, কণ্ডু বিশিষ্ট ও অল্প বেদনাযুক্ত হয় ইহা বাতজ বসন্তের ন্যায় বিলম্বে পাকে। ইহাতে কফস্রাব, শরীর আর্দ্র ও ভার বোধ, বমন বেগ অরুচি, নিদ্রা, তন্দ্রা, আলস্য ও শিরঃপীড়া এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়

বাত-পিত্তজ বসন্ত ঃ—বায়ু ও পিত্তের প্রকোপনের মাত্রা হিসাবে উহাদের মিশ্রিত লক্ষণগুলি অল্পাধিক পরিমাণে দেখা যায়।

বাত-শ্লেষ্মজ ঃ—ঐ উভয় দোষের লক্ষণই এক্ষেত্রে বর্ত্তমান থাকে ব্রণগুলি অত্যন্ত কণ্ডু বিশিষ্ট ও তীব্র বেদনাযুক্ত হয়

পিত্ত শ্লেষ্মজ ঃ ঐ উভয় দোষের লক্ষণই দোষের বলাবল হিসাবে প্রকাশ পায়

ত্রিদোষজ বসন্ত ঃ— এই বসন্ত নীলবর্ণ, চিঁড়ার ন্যায় চ্যাপ্টা, মধ্যভাগে নিম্ন, অত্যন্ত বেদনাযুক্ত ও দুর্গন্ধ স্রাব নিঃসারক। ইহা পরিমাণে অধিক হয় ও দীর্ঘকালে পাকে এ বসন্ত অসাধ্য।

চর্ম্মদল ঃ—ইহাও একপ্রকার ত্রিদোষজ বসন্ত। ইহাতে উপরি-উক্ত ত্রিদোষজ বসন্তের প্রায় সকল লক্ষণই দেখা যায়। তাহার উপর আবার কণ্ঠরোধ, অরুচি, তন্দ্রা, প্রলাপ ■ চিত্তবিভ্রম প্রভৃতি উপদ্রবও উপস্থিত হয়। ইহাও অসাধ্য রোগ।

এখানে বলিয়া রাখা ভাল যে, উপরে চর্ম্মদল ও ত্রিদোষজ বসন্ত সম্বন্ধে যাহা আমরা লিখিয়াছি, তাহা উহাদের সাধারণ লক্ষণ মাত্র। মনে রাখিতে হইবে, বায়ু, পিত্ত, শ্লেষ্মা ও রক্তদুষ্টির মিলনের বলাবল-অনুসারে এই ত্রিদোষজ বসন্তের নানা প্রকার বর্ণ ও নানা প্রকার লক্ষণ উপস্থিত হয়

রোমান্তী বা হাম ঃ—ইহাতে রোমকূপের ন্যায় উন্নতি বিশিষ্ট রক্তবর্ণ পিড়কা উৎপন্ন হয় ইহাতে কাস ও অরুচি এই দুই লক্ষণ প্রকাশ পায়। ইহা কফ-পিত্তজ ব্যাধি

রসগত-বসন্ত ঃ—ইহা জল-বুদ্‌বুদের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট। ইহাতে দোষের প্রকোপ অধিক থাকে না ইহা বিদীর্ণ হইলে ইহার ভিতর হইতে জলের মত পদার্থ নির্গত হয়। এইজন্য চলিত ভাষায় ইহাকে জল বসন্ত বা পানি-বসন্ত বলে।

রক্তগত বসন্ত ঃ—ইহার পিড়কা রক্তবর্ণ ও পাতলা-চর্ম্মবিশিষ্ট হয় ইহা শীঘ্রই পাকে ইহা সাধ্য বটে, কিন্তু রক্তদুষ্টির আধিক্য থাকিলে কষ্টসাধ্য হয়। ইহা ফাটিলে রক্ত বাহির হয়।

মাংসগত বসন্ত ঃ—ইহার গুটীগুলি কঠিন, স্নিগ্ধ ও পুরু চর্ম্মবিশিষ্ট ইহা বিলম্বে পাকে ইহাতে শরীরে বেদনা, তৃষ্ণা, কণ্ডু, জ্বর ও চিত্তচাঞ্চল্য বিদ্যমান থাকে ইহা কষ্টসাধ্য রোগ।

মেদোগত বসন্ত ঃ— ইহার ব্রণ সকল গোলাকার, কোমল, অল্প উন্নত, স্থূল চর্ম্মবিশিষ্ট, চিক্কণ ও বেদনাযুক্ত। ইহাতে

মোহ, চিত্ত-চাঞ্চল্য, সন্তাপ প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত হয়। এই [redacted] ব্যাধি প্রাণনাশক

অস্থি ও মজ্জাগত বসন্ত ঃ—ইহার গুটীসকল ক্ষুদ্রাকৃতি, রুক্ষ, চিড়ার ন্যায় চ্যাপটা, অল্প উন্নত ও গাত্র-চর্ম্মের সমান-বর্ণবিশিষ্ট হয়। ইহাতে অত্যন্ত মোহ, বেদনা ও চিত্তচাঞ্চল্য প্রকাশ পায়। মর্ম্মস্থান সকল যেন ছিন্ন হইতে থাকে ও সর্ব্বাঙ্গের অস্থি যেন ভ্রমর দ্বারা বিদ্ধ হইতেছে, এইরূপ বোধ হয়। ইহাও আশু প্রাণনাশক

শুক্রগত বসন্ত ।— ইহা দেখিতে পকাভ, কিন্তু পক নহে ইহা চিক্কণ, সূক্ষ্ম ও [redacted] বেদনাযুক্ত হয়। ইহাতে শরীর আর্দ্র, চিত্তচাঞ্চল্য, মোহ, দাহ [redacted] উন্মত্ততা প্রভৃতি উপদ্রব প্রকাশ পায়। ইহাও আশু প্রাণনাশক।

এখানে মনে রাখিতে হইবে, সপ্তধাতুর আশ্রয়-ভেদে বসন্ত সাত প্রকার হইলেও ত্রিদোষের প্রভাব হইতে উহারা মুক্ত নহে। সপ্ত ধাতুগত বসন্তেও বাতাদি দোষের প্রকোপ দৃষ্ট হয়। মিলিত দোষের অল্পাধিক প্রকোপ-অনুযায়ী ঐ সপ্ত ধাতুগত বসন্ত উপরি উক্ত লক্ষণ ছাড়া আরও নানাপ্রকার লক্ষণ সহ প্রকাশ পাইতে পারে

সাধ্য, কষ্টসাধ্য ও অসাধ্য বসন্তের উল্লেখ।

সাধ্য ঃ—হাম, পাণি বসন্ত বা রসগত বসন্ত, রক্তগত বসন্ত, পিত্তজ-বসন্ত, শ্লেষ্মজ বসন্ত ও পিত্ত-শ্লেষ্মজ বসন্ত সুখসাধ্য।

কষ্টসাধ্য ঃ—বাতজ, বাত-পিত্তজ ও বাত-শ্লেষ্মজ বসন্ত কষ্টসাধ্য।

অসাধ্য ঃ—ত্রিদোষজ বসন্ত, চর্ম্মদল অস্থি-মজ্জাগত বসন্ত ও শুক্রগত বসন্ত সাধারণতঃ অসাধ্য ব্যাধি বলিয়া গণনীয়

বসন্তের অবস্থাগত অসাধ্য লক্ষণ

এই রোগে যাহার কাস, হিক্কা, প্রবল মোহ, প্রবল জ্বর, অত্যন্ত বেদনা, প্রলাপ, চিত্ত-চাঞ্চল্য, মূর্চ্ছা, পিপাসা, দাহ, অতি নিদ্রা, শরীর ঘূর্ণন, মুখ চোখ বা নাক হইতে রক্তস্রাব, গলায় ঘড় ঘড় শব্দ অতি কষ্টে শ্বাস ত্যাগ প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হয়, তাহার প্রাণ-সংশয় জানিবে রোগী যদি মুখ ভিন্ন কেবল নাক দিয়াই ঘন ঘন শ্বাস ত্যাগ করে, এবং যদি সে তৃষ্ণার্ত্ত ও অপতানকাদি বাতব্যাধি গ্রস্ত হয়, তাহা হইলে তাহারও মৃত্যু অনিবার্য্য জানিবে

বসন্তের পর উপদ্রব

বসন্ত আরোগ্য হওয়ার পর কখনও কখনও কণুয়ে, হাতের কব্জিতে ও কাঁধে শোথ জন্মায়। ইহা অতি কষ্টপ্রদ ও দুশ্চিকিৎসত্ব রোগীকে অতিরিক্ত শীত-ক্রিয়া করাইলেই এই প্রকার উপদ্রব উপ-স্থিত হয়। অত্যন্ত রুক্ষ-ক্রিয়াও ভাল নহে তাহার ফলে অ ক

সময় রোগীকে বসন্তের হাত হইতে মুক্তি লাভ করিয়াও মাথাঘোরা পেটের অসুখ ও দুর্ব্বলতা প্রভৃতি রোগে ভুগিতে হয়

চিকিৎসার কথা।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বসন্ত হইবার পূর্ব্বে যে জ্বর হয়, তাহা দুই তিন দিনের বেশী স্থায়ী হয় না চিকিৎসা-শাস্ত্রও বলিয়াছেন,—"দ্বাত্রিংশৎ প্রহর পর্য্যন্তং জ্বর ভোগো বিধীয়তে পাদাবশিষ্টে জ্বরে স্থিতে বসন্তগুড়িকোদ্ভূতা সম্ভবতি।"—অর্থাৎ, বসন্ত জ্বরের সম্পূর্ণ ভোগ কাল ৯৬ ঘণ্টা, কিন্তু ৭২ ঘণ্টা জ্বর ভোগের পর বসন্ত স্ফোটক বাহির হইতে থাকে। এ সময়ে অনেকে বলেন যে, ঔষধাদি প্রয়োগ না করাই যুক্তিসঙ্গত আমরা কিন্তু তাহা মনে করি না বসন্ত হউক, আর নাই হউক, এই জ্বরকালে রোগীকে বমন করান উচিত। বিশেষতঃ, রোগীর বসন্ত হইতে পারে, এরূপ সন্দেহ হইলে ক্ষণ-বিলম্ব না করিয়া বমন করাইয়া দিবে। এক ভরি সৈন্ধব একছটাক গরমজলে গুলিয়া খাওয়াইয়া দিলে অতি শীঘ্র সহজেই বমি হইয়া যায়। বসন্ত দেখা দিলেও বমন-কর্ম্ম হিতকর। চক্রদত্তও বলিয়াছেন,—'সর্ব্বপ্রকার বসন্তরোগে বমন অতীব হিতকর

বলিয়া জানিবে। বমন ঔষধের ক্রিয়া জানিলে বমনের ব্যবস্থা যে এ ক্ষেত্রে কতটা উপযোগী ও উপকারী, তাহ বুঝা যায়। শার্ঙ্গধর বলিয়াছেন,—'যে ঔষধ অপক্ক পিত্ত, শ্লেষ্মা ও অন্নকে বলপূর্ব্বক মুখ-মার্গ দিয়া বহি র্নিঃসারিত করে, তাহাকে বমন-ঔষধ কহে।' আবার বাগভটও বলিয়াছেন যে, আমাশয় হইতে পীত দ্রব্যাদি মলকে আশু নির্হরণ করিবার আসন্ন পথ হইতেছে মুখ।' এ'দিকে দেখা যায়, দুষ্ট পিত্ত ও শ্লেষ্মাই এ রোগের মূল কারণ। সুতরাং এই রোগের আরম্ভ-কালে বমন-ক্রিয়া যে অতি হিতকর, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। রোগের গোড়ায় দুষ্ট পিত্ত ও শ্লেষ্মা যদি বাহির হইয়া যায়, তাহা হইলে রোগ পরে আর প্রবল আকার ধরিতে পারে না।

এখানে মনে রাখিতে হইবে, উপরে আমরা গরমজলে সৈন্ধব গুলিয়া বমনের জন্য যে ব্যবস্থার উল্লেখ করিয়াছি, তাহা জ্বর-কালেই উপযোগী। বসন্ত দেখা দিলে উহা না দিয়া নিম্নোক্ত যে কোনও একটি পাচন বা যোগ দ্বারা বমন করান উচিত।

পাচন প্রস্তুত-বিধি ঃ—

পাচনের ফর্দ্দ দিবার পূর্ব্বে পাচন-প্রস্তুতের নিয়মটুকু এখানে বলিয়া রাখিতেছি। তাহা হইলে এক কথা বারংবার বলিতে হইবে না। পাচনে যতগুলি জিনিষ থাকে, তাহ সমাংশে মিলিত করিয়া সর্ব্বশুদ্ধ দুইতোলা ওজনের ভারী হওয়া চাই। পাচনে যদি একটি জিনিষ থাকে, তবে ঐ একটি জিনিষই দুই তোলা হিসাবে লইতে হইবে। জিনিষগুলি যেন অপরিষ্কার ও পোকাধরা না হয়। পরে

উহা অধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইতে হয়। আগুনের জ্বাল মৃদু হওয়া দরকার।

পাচনে অনেক সময় প্রক্ষেপ দিবার বিধি থাকে। সুতবাং, প্রক্ষেপ কাহাকে বলে, তাহাও এখানে জানিয়া বাখা প্রয়োজন। যাহা পাচনের সঙ্গে গুলিয়া খাইতে হয়, তাহাকে প্রক্ষেপ বলে প্রক্ষেপেব জিনিষগুলি উত্তমরূপে চূর্ণ কবিয়া কাপড়ে ছাঁকিয়া লইতে হয়। পরে ঐ সকল দ্রব্য সমাংশে মিশ্রিত সর্ব্বসমেত আধতোলা পারিমাণ লইয়া পাচনে মিশাইতে হয়।

বমনের জন্য পাচন।

১ পলতা, নিমপাতা, বাসকপাতা, বচ, ইন্দ্রযব, যষ্টিমধু ও মদনফল।

২। মদনফল, যষ্টিমধু, নিমছাল ও ইন্দ্রযব

৩। পলতা, নিমপাতা ও বাসকছালের পাচন কবিয়া তাহাতে বচ, ইন্দ্রযব, যষ্টিমধু ও মদনফলের প্রক্ষেপ দিয়া সেবনীয়।

৪। পলতা ও নাটাকরঞ্জার পাচন করিয়া তাহাতে মদনফলের প্রক্ষেপ দিয়া খাইতে হয়

৫। ইন্দ্রযবের কাথে মদনফলের প্রলেপ দিয়া সেবন করা যায়

যোগ ঃ—(১) ব্রাহ্মী শাকের রস দুই তোলা, অথবা হিঞ্চা শাকের রস দুই তোলা লইয়া তাহাতে মধু চারি মাষা মিলাইয়া সেবন করিতে হয়

(২) দুই তোলা নিমছালের রসে চারি মাষা মধু মিশাইয়া সেবন করিলেও বমি হয়

চক্রদত্ত বলেন ঃ—'বসন্তরোগীর বমন করান হইলে পরে বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ করিবে। কিন্তু রোগী দুর্ব্বল হইলে বিরেচক ঔষধ না দিয়া সংশমন যোগ প্রদান করিবে।'

আমাদের মতে রোগী অতি দুর্ব্বল হইলে ব রোগিনীর গর্ভাবস্থা হইলে বেশী বমন ও বিরেচন উভয়ই প্রশস্ত নহে এক্ষেত্রে শমনীয় ঔষধই প্রযোজ্য। তবে অধিকাংশ স্থলেই বমনের পর বিরেচনের দ্বারা রোগীর শরীর পরিশুদ্ধ করা কর্ত্তব্য।

বিরেচক ঔষধ ঃ (১) বিরেচন করাইতে হইলে তেউড়ী মূলের চূর্ণ আধতোলা আন্দাজ লইয়া বাতপ্রধান রোগীকে গরমজল সহ, পিত্ত প্রধান রোগীকে দুগ্ধ সহ ও শ্লেষ্মাপ্রধান রোগীকে কিসমিসের ক্বাথ সহ সেবন করাইতে হয়।

(২) যে কোনও প্রকার বসন্ত হউক না কেন, সকল বসন্ত রোগের ও হামের প্রথম অবস্থায় উচ্ছেপাতার রস দুই তোলা লইয়া তাহাতে চারি আনা পরিমাণ হরিদ্রাচূর্ণ মিশাইয়া পান করিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায় ইহাতে মৃদু বিরেচন হয়। ইহা হাম-জ্বর বিস্ফোট বিনষ্ট করে

(৩) আমলা, বহেড়া ■ হরিতকীর ক্বাথে ঘৃত ■ তেউড়ী-মূল চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে বিরেচন হয়। ইহা জ্বরঘ্ন ও নিরাপদ বিরেচক ঔষধ।

(৪) পলতা, কটকী, নাট, দারুহরিদ্রা, যষ্টিমধু ও জলবহলা, প্রত্যেকটি সাড়ে পাঁচ আনা হিসাবে ওজন করিয়া সবগুলি একত্রে আধপোয়া জলে রাত্রে ভিজাইয়া রাখিতে হয়। সকালে উহা ছাঁকিয়া লইয়া সেবন করিলে সামান্য বিরেচন ও রোগ-যন্ত্রণার অনেক উপশম হয়। অধিক বিরেচনের আবশ্যক হইলে ঐ জলে চারি আনা পরিমাণ গব্যঘৃত ও চারি আনা তেউড়ী মূল চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিতে হয়।

এইরূপ বমনকারক ও বিরেচক ঔষধ প্রয়োগের পর রোগের প্রায় সর্ব্বাবস্থায় যে সকল ঔষধ, মুষ্টিযোগ ও পাচনাদি ব্যবহার করা উচিত, এইবার তাহারই উল্লেখ করিব। যদি কোনও রোগীকে বমন ও বিরেচন করাইবার সুযোগ না ঘটে, তাহা হইলে সে রোগীর পক্ষেও নিম্নলিখিত যে কোনও একটী ঔষধ প্রযোজ্য।

সর্ব্বপ্রকার বসন্তের সর্ব্বাবস্থায় প্রযোজ্য।

ঔষধ ঃ—১। মকরধ্বজ ব রসসিন্দুর—হাম ও বসন্তের সকল অবস্থায় উপকারী। তবে রোগের প্রকার ভেদ হিসাবে উহার অনুপানও বিভিন্ন প্রকার হইবে।

২। কজ্জলী সর্ব্বপ্রকার বসন্তের সকল অবস্থায় প্রয়োগ করা চলে। ইহাও একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। মনে রাখিতে হইবে, এ কজ্জলী

শোধিত পারা এক ভাগ ও শোধিত গন্ধক দুই ভাগ মিশাইয়া করিতে হয় ইহার অনুপান—পানের রস •

৩ ইন্দুকলা বটিকা :—মসূরিকা, বিস্ফোট ও সর্ব্বপ্রকার বসন্ত রোগে ইহা হিতকর শিলাজতু, লৌহ ও স্বর্ণ প্রত্যেক সমভাগ লইয়া বাবুই তুলসীর রসে মাড়িয়া এক রতি প্রমাণ বটিকা করিতে হয়

৪ উষণাদি চূর্ণ—হাম ও বসন্তের সকল অবস্থায় সেবনীয়। ইহার প্রস্তুত প্রণালী মরিচ, পিপুলমূল, কুড়, গজপিপ্পলী, মুতা, যষ্টিমধু, মূর্ব্বামূল, বামনহাটী, মোচরস, বংশলোচন, যবক্ষার, আতইচ, বাসকছাল, গোক্ষুর, বৃহতী ও কণ্টিকারী প্রত্যেক সমভাগ চূর্ণ একত্রে মাড়িতে হয় মাত্রা ১মাষা, অনুপান—জল।

৫ সর্ব্বতোভদ্র রস সর্ব্বপ্রকার বসন্তের মহৌষধ ইহার প্রস্তুত-প্রণালী—রসসিন্দুর, অভ্র, রৌপ্য, স্বর্ণ ও মনঃশিলা প্রত্যেক একভাগ, বংশলোচন দুইভাগ ও গুগ্গুল সাত ভাগ এই সমস্ত এক সঙ্গে জল দিয়া মাড়িয়া একমাষা প্রমাণ বটিকা করিতে হয় যথা যোগ্য অনুপানের সহিত সেবনীয়

৬ দুর্লভরস বসন্তরোগের সকল অবস্থায় হিতকর প্রস্তুত-প্রণালী—শোধিত পারদ, শোধিত গন্ধক, বলা নাগবলা, পিপুল, আমলকী ও রুদ্রাক্ষ প্রত্যেক সমভাগ চূর্ণ একত্র মর্দ্দন করিবে মাত্রা ১ রতি। অনুপান—ঘৃত ও মধু।

পাচন ঃ—১ দুইতোলা অনন্ত মূল আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইতে হয়। সর্ব্ব-প্রকার বসন্তের সকল অবস্থায় এই কাথ উপকারী

২ পলতা, গুলঞ্চ, মুতা, বাসকছাল, দুরালভা, চিরেতা, নিমছাল, কটকী [illegible] ক্ষেতপাপড়া—এই নয় প্রকার মিলিত দ্রব্যের পাচন প্রত্যহ দুই বেলা সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার বসন্তের সক অবস্থায় বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

৩ নিমছাল, পলতা, ক্ষেতপাপড়া, কটকী, আকনাদিমূল, হরীতকী, বেণার মূল, রক্তচন্দন, শ্বেতচন্দন, আমলকী, বাসকমূলের ছাল, দুরালভা—এই বারটি মিলিত দ্রব্যের পাচন বসন্তরোগীকে প্রথম অবস্থা হইতে পক্কাবস্থ পর্য্যন্ত পানার্থ প্রদান করিলে রোগের বিশেষ উপকার হয়

যোগ ঃ—১। রুদ্রাক্ষচূর্ণ দুই আনা ও মরিচচূর্ণ দুই আনা একত্রে মিশাইয়া একটু বাসি-জলে গুলিয়া প্রত্যহ দুই বেলা সেবন করিলে বসন্তের সকল অবস্থায় উপকার দর্শে।

২ শেয়ালকাঁটার পেষিত মূল চারি আনা বাসি জলের সহিত প্রত্যহ দুইবার সেব্য।

[illegible] মরিচচূর্ণ বার রতি ও কড়িভস্ম চূর্ণ বার রতি মিলিত করিয়া বাসি জলে গুলিয়া প্রত্যহ দুইবার সেবন করা বিধি

৪। হরিদ্রাচূর্ণ বার রতি ও কচি তেঁতুলপাতা বার রতি জলে গুলিয়া প্রত্যহ দুইবার সেব্য।

আমাবস্থার চিকিৎসা।

সকল প্রকার হাম ও বসন্তের আমাবস্থায় যে সকল পাচন ও মুষ্টিযোগ প্রয়োগ করিলে উপকার পাওয়া যায়, এইবার তাহারই উল্লেখ করিতেছি।

পাচন ঃ—(১) কুমারিয়া লতার মূল-সিদ্ধ-পাচনে ঘিয়ে ভাজা দশ কুঁচ পরিমাণে হিং প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিতে হয়।

মুষ্টিযোগ ঃ—(১) আধতোলা জন্তী বীজ বাসি জলে পেষণপূর্ব্বক সেবনীয়।

(২) আধ তোলা কৃষ্ণচূড়ার মূল বাসি জলে পেষণ করিয়া সেবনীয়।

(৩) মদনপুষ্পের মূল একতোলা, মরিচ একতোলা, আধপোয়া বাসি জলে রাত্রিতে ভিজাইয়া পরদিন প্রাতঃকালে সেবন করিলে উপকার পাওয়া যায়।

(৪) নাটা করঞ্জের মূল চারি আনা ও মরিচ চারি আনা একত্রে বাটিয়া সেবনীয়।

পচ্যমানাবস্থায় চিকিৎসা।

ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি, এই সময় রোগীর আর একবার জ্বর দেখা দেয়। এই জ্বর-ত্যাগ-জন্য আদার রস ও মধু অনুপানে দিবসে দুইবার লাল মৃত্যুঞ্জয় ঔষধ সেবন হিতকর। পচ্যমানাবস্থা যত

শীঘ্র পক্বাবস্থায় পরিণত হয়, ততই ভাল —সেইদিকেই দৃষ্টি রাখা দরকার। এ সময়ে এই পাচনটি বড় উপকারী ,- গুলঞ্চ, যষ্টিমধু, ইক্ষু-মূল ও দাড়িম সিদ্ধ পাচনে ইক্ষু গুড় প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে বসন্ত শীঘ্র পাকিয়া উঠে ইহা বায়ুদোষ-নাশক এই পাচন ছাড়া, এ অবস্থায় যে সকল মুষ্টিযোগ ব্যবহার করা চলে, তাহার উল্লেখও এখানে করিতেছি ৷— (১) কুল চূর্ণ [redacted] ইক্ষু গুড় একত্র মিলাইয়া খাইলে বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক বসন্ত শীঘ্র পাকিয়া উঠে। (২) আধতোলা গোক্ষুরী-মূল আতপ চাউল ধোয়া জলে বাটিয়া সেবনীয়। (৩) হলুদ পাতা চারি আনা ও তেঁতুল পাতা চারি আনা একসঙ্গে বাটিয়া সেবন করিলে উপকার হয়, এবং দাহ নিবারণ হয়।

শাস্ত্রকার বলেন, শরীরে অত্যন্ত বেশী বসন্ত বাহির হওয়ার জন্য কষ্ট বোধ হইলে, সে সময়ে রোগীর গাত্রে যত বসন্ত বাহির হইয়াছে, তাহা গুণিয়া, রোগীর নাম উচ্চারণপূর্ব্বক ততগুলি চালিতার পাতা ছিন্ন করিলে গায়ে আর বসন্ত বাহির হয় না।

পক্বাবস্থা।

বাতজে ঃ—বাতজ-বসন্তে উপবাসাদি রুক্ষ-ক্রিয়া ভাল নহে। এ ক্ষেত্রে খৈ, চিনি ও জল মিশাইয়া পথ্য দেওয়া উচিত। পারাবত-মাংসের যূষও এ সময় দেওয়া যাইতে পারে। এই অবস্থায় নিম্নলিখিত যে কোনও একটি পাচন সেবন প্রশস্ত।

(১) গুলঞ্চ, যষ্টিমধু, রাস্না, শালপানী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, রক্তচন্দন, গাম্ভারী ছাল, বেড়েলা মূল, বৈচি মূল, প্রত্যেকে সাড়ে তের কুঁচ পরিমাণে গ্রহণীয়

(২) বেলছাল, শোণাছাল, গাম্ভারী ছাল, পারুল ছাল, গণিয়ারী ছাল, শালপাণী, চাকুলিয়া, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, রাস্না, দারুহরিদ্রা, দুরালভা, বেণামূল, গুলঞ্চ, ধন্যা, মুতা, প্রত্যেকে সাড়ে নয় কুঁচ পরিমাণে গ্রহণীয়

পিত্তজে ■ পিত্তজ-বসন্তেও দুইটি পাচনের উল্লেখ করিতেছি ইহার মধ্যে যে কোনও একটি সেব্য

(১) নিমছাল, আকনাদি, ক্ষেতপাপড়া, পলতা, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, বেনামূল, কটকী, আমলা, বাসক, দুরালভা এই পাচনে আধতোলা চিনি প্রক্ষেপ দিয়া খাইতে হয়

(২) কিসমিস্, পিণ্ডীখেজুর, গাম্ভারী ফল পল্‌তা, নিমছাল, বাসকমূলের ছাল, খই, আমলা, দুরালভা প্রত্যেকে সমাংশে গ্রহণীয়।

শ্লেষ্মজে ■—শ্লেষ্মজ বসন্তে নিম্নলিখিত দুইটি পাচনের মধ্যে যে কোনও একটি সেবনীয়

(১) দুরালভা, চিরতা, ক্ষেতপাপড়া ■ কটকী প্রত্যেককে আধতোলা লইয়া সিদ্ধ করিবে

(২) বাসক, চিরতা, মুথা, আমলা, বহেড়া, হরীতকী, ইন্দ্রযব, দুরালভা, পলতা ■ নিমপাতা সিদ্ধ পাচনে চারি আনা আন্দাজ মধু প্রক্ষেপ দিয়া সেবনীয়

দ্বন্দ্বজে ঃ দ্বন্দ্বজ অর্থাৎ পিত্ত-শ্লেষ্মজ, বাত-শ্লেষ্মজ প্রভৃতি কোনও দুই দোষ প্রধান-বসন্তের পক্কাবস্থায় উভয় দোষনাশক ঔষধ ব্যবহার করিতে হয় সুতরাং দোষের বলাবল বুঝিয়া উপরি উক্ত পাচনের মধ্যে দুইটি পাচন ব্যবহার করা যায়

সন্নিপাতজ-বসন্ত ঃ এই বসন্তে যে দুইটী পাচনের উল্লেখ করিতেছি, তাহারা রোগের লক্ষণ-অনুসারে প্রয়োজ্য

(১) হরিতকী, দেবদারু যষ্টিমধু, কটকী, দন্তীমূলের ছাল, পিপুল, পলতা, রক্তচন্দন, দারুহরিদ্রা, জলবহলা ও রাখাল শশা —এই পাচনে আধতোলা আন্দাজ ঘৃত প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিতে হয়। ইহা পচ্যমানাবস্থাতেও উপকারী। ইহা শোথ, জ্বর, দাহ, তৃষ্ণা, সন্তাপ ও বিষ দোষ নষ্ট করে

(২) নিমপাতা, ক্ষেতপাপড়া, আকনাদি, পলতা, কটকী বাসক, দুরালভা, আমলকী, বেণামূল, শ্বেতচন্দন ও রক্তচন্দন—এই পাচনে আধতোলা আন্দাজ চিনি প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিতে হয় ইহা সর্ব্বপ্রকার সন্নিপাতজ বসন্তে উপকারী। তাহা ছাড়া, যে বসন্ত একবার শরীরে দেখা দিয়া আবার মিলাইয়া যায়, তাহার পুনরুত্থানের পক্ষেও ইহা প্রশস্ত

এই সব পাচন ছাড়া বসন্তরোগের আরও অনেক পাচন আছে বাহুল্যভয়ে সে সব পাচনের আর উল্লেখ করিলাম না। এ পর্য্যন্ত যে সকল পাচন, মুষ্টিযোগ ও ঔষধাদির কথা বলিয়াছি, তাহা সুলভ প্রাপ্য এবং অনেকস্থলেই পরীক্ষিত। এইবার প্রলেপের

কথা বলিব রোগের পচ্যমান ও পক্বাবস্থায় প্রলেপ দেওয়া উচিত

প্রলেপ

যাহা বাটিয়া গায়ে লাগাইতে হয়, তাহাকে প্রলেপ বলে। প্রলেপের নির্দিষ্ট পরিমাণ নাই, তবে প্রলেপ-উক্ত জিনিষগুলি সমান মাত্রায় গ্রহণ করিতে হয়। প্রলেপ শুকাইতে না শুকাইতেই উঠাইয়া ফেলিয়া নূতন প্রলেপ দিতে হয় প্রলেপ অত্যন্ত পাতলা হওয়া ভাল নহে, আবার অত্যন্ত পুরু হওয়াও ভাল নহে রাত্রিতে প্রলেপ দেওয়া উচিত নহে প্রতি রোমকূপের উপর ধীর হস্তে প্রলেপ লাগাইতে হয়। প্রলেপে যেখানে ঘৃত মিশাইবার কথা আছে, সেখানে পুরাতন ঘৃত বুঝিতে হইবে পুরাতনের অভাবে নূতন ঘৃত জলে মথিয়া ব্যবহার করিতে হয় প্রলেপে ঘৃতের ভাগ অত্যন্ত অধিক বা নিতান্ত অল্প হওয়া ভাল নহে।

বসন্তে নিম্নলিখিত প্রলেপগুলি হিতকর শেষোক্ত দুইটী প্রলেপ ছাড়া আর সবগুলিই প্রায় সর্ব্বপ্রকার বসন্তের পচ্যমান ও পক্বাবস্থায় হিতকর। বসন্ত রোগে দোষ ভেদে প্রলেপের ভেদ-নির্দ্দেশ না করিলেও চলে কারণ, এ রোগের প্রলেপ মাত্রই রক্ত ও পিত্তের উপশমকারী

১ যব বাটিয়া ঘৃত মিশ্রিত করিবে।

২। নূতন বটের ঝুরি ও কলাগাছের থোড় সমান ভাগে বাটিয়া ঘৃত মিশ্রিত করিতে হয়।

৩। বটের পাতা ঘৃতের সহিত বাটিয়া দিবে।

[illegible] পদ্মের ডাঁটা ও [illegible] ঘৃত মিশ্রিত করিয়া দিবে

৫। শিরীষের ছাল ও বেড়েলার মূল বাটিয়া ঘৃত মিশ্রিত করিবে।

৬। শতমূলী ও ভূমিকুষ্মাণ্ড বাটিয়া ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া গায়ে দিবে।

৭ অনন্তমূল ঘৃতসহ বাটিয়া গায়ে মাখাইবে।

৮। নিম-গুলঞ্চ [illegible] নিসিন্দার পাতা ঘৃতের সহিত বাটিয়া ব্যবহার করা যায়।

[illegible] যজ্ঞডুমুর, অশ্বথ, বট, পাকুড় ও বেত এই সকল গাছের মধ্যে যতগুলি গাছের ছাল পাওয়া যায়, তাহাদের একত্রে করিয়া ঘৃতসহ বাটিয়া প্রলেপ দিবে

১০ যবচূর্ণ ও যষ্টীমধু সমভাগ লইয়া পেষণপূর্ব্বক ঘৃত মিশাইয়া গায়ে লেপন করিতে হয়।

১১ বেণামূল [illegible] মৃণাল জল-দ্বারা পেষণ করিয়া ঘৃত মিশাইতে হয়

১২। দারুহরিদ্রা, হরীতকী, বালা, বেড়েলামূল, ও যষ্টীমধু, ঘৃত-সহ প্রলেপ।

১৩ শোণালুর পাতা, চালতার ছাল, নিসিন্দার পাতা, কাকমাচি, শিরীষ ফুল, ঘৃতসহ প্রলেপ।

১৪। কেহ কেহ বলেন, পদ্মের ডাঁটার মূলে যে কাদা লাগিয়া থাকে, তাহার প্রলেপ উপকারী

১৫। বেণার মূল ও যজ্ঞডুমুরের ছাল খয়েরের জলে বাটিয়া অপক বসন্তে প্রলেপ দিলে উহা শীঘ্র পাকিয়া উঠে

১৬ ট্যাবা লেবুর ফুলের কেশর আমানির সহিত বাটিয়া অপক বসন্তে প্রলেপ দিলে উহা পাকিয়া উঠে এবং দাহ দূর হয়।

উপদ্রব চিকিৎসা

বসন্ত না উঠিলে ঃ—বসন্ত ঠিকমত না উঠিলে নালিতা পাতা সিদ্ধ গরম জলের স্বেদ দিতে হয়। ইহাতে যদি না উঠে, তাহা হইলে কুলথ-কলাই, তল্দা-বাঁশপাতা ও ফুলে মেথি— এই তিনটি জিনিষ সিদ্ধ গরম জলের স্বেদ দিবে। ইহাও যদি ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে মালতী ফুলের শিকড় বাটিয়া গায়ে প্রলেপ দিলে সকল রকম বসন্ত ফুটিয়া বাহির হয়।

বসন্ত-স্ফোটক বাহির হইয়া আবার যদি দেহ-মধ্যে মিলাইয়া যায়, তাহা হইলে রক্ত কাঞ্চনের ছাল সিদ্ধ পাচনে দুই আনা আন্দাজ শোধিত স্বর্ণ-মাক্ষিক চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া রোগীকে তাহা খাওয়াইতে হয় ইহাতে গুটিকা পুনরুত্থিত হইয়া পাকিবার উপযুক্ত হয়।

কচি লাউ পোড়াইয়া ঐ ছাই গায়ে মাখাইলে গুটিকা পুনরুত্থিত হয়

আদা ও তুলসীপাতার রস এক ঝিনুক খাওয়াইয়া দিলে, অথবা তুলসীপাতার সহিত যোয়ান বাটিয়া সর্ব্বাঙ্গে মাখাইলে, অথবা মেথি

ভিস্থান্‌ জল ও বাবুই তুলসীর কাথ, কিম্বা কলমী শাকের ঝোল খাওয়াইলে বসন্তের গুটি সকল ঝাড়িয়া বাহির হইয়া যায়।

তেলাকুচা পাতার রসের সহিত কাঁচা হলুদের রস মিশাইয়া মাখাইলে বসন্ত সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ পায়

বসন্ত লাট খাইয়া গেলে অর্থাৎ বাহির হইয়া আবার ডুবিয়া গেলে, কুল গাছের ডগা বান্দিয়া জলে গুলিয়া হস্তদ্বারা ঐ জল মন্থন করিলে জলের উপর যে ফেনা উঠিবে, সেই ফেনা রোগীর সর্ব্বাঙ্গে মাখাইয়া দিলে লাট খাওয়া বসন্ত পুনর্ব্বার প্রকাশ পায়

দাহ-নিবৃত্তির উপায়ঃ ১। পটোল মূল ও রক্ত কাঁটা নাটের কাথে হলুদ ও আমলকী চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে সকল প্রকার বসন্তের দাহ দূর হয়।

২। দুইভাগ জলে একভাগ মধু মিশাইয়া পান করিলে গাত্র দাহ নিবারণ হয়

৩ *পদ-তলে দাহ-নিবারণ জন্য* আতপ চাউল-ধোয়া জল পদতলে সর্ব্বদা সিঞ্চন করিলে উপকার পাওয়া যায়

পিপাসাঃ—১ । বসন্ত-রোগীর পিপাসা বেশী হইলে কলাগাছের শিকড় সিদ্ধ করিয়া সেই জল অল্প অল্প পান করিলে পিপাসার শান্তি হয়।

২। *ক্ষেতপাপড়া, বেণার মূল, পদ্মকাষ্ঠ, শুঁঠ, বেলশুঁঠ* ও মুতা—এই পাচন সিদ্ধ জল ছাঁকিয়া লইয়া অল্পমাত্রায় পান করিলে পিপাসা দূর হয়।

অতীসার ঃ—১ বসন্ত-রোগীর অতীসার হইলে জাম-পাত ও আমপাতা সমাংশে পেষণ করিয়া দধি ও মধুসহ সেবন করিতে হয়।

২ গোক্ষুর বীজ, আতইচ ও ক্ষেতপাপড়া—এই তিনটি জিনিষ সমাংশে পেষণ করিয়া মধু ও চিনি মিশাইয়া খাইতে হয় ইহাও বসন্তরোগের অতীসারে প্রযোজ্য

৩। হামরোগে ভেদ হইলে এক ঝিনুক ইন্দুর কানি পানা রসে একটু সৈন্ধব মিশাইয়া সেবন করিতে দিবে।

৪। অথবা দাড়িম ফুলের কুঁড়ি, বড় এলাইচ ও কর্পূর এই তিন দ্রব্যকে ঈষৎ ভস্ম করিয়া, সেই ভস্ম সমভাগে লইয়া আতপ চাউল-ধোয়া জলসহ সেবন করিলে উপকার হয়

অতীসার ও বমন ঃ বসন্তরোগীর অতীসার ও বমন একত্রে প্রকাশ পাইলে আধতোলা দাড়িমের ছাল ও আধতোলা কুটজের ছাল জল দিয়া বাটিয়া দধি ও মধুসহ দুই তিনবারে সেবন করিতে হয়

বমন ও মুখ-শোষ ঃ—হরীতকী চূর্ণ চারি আনা, ট্যাবা লেবুর রস একতোলা চিনি চারি আনা একত্র মিশাইয়া সেবন করিলে [illegible] ও মুখ-শোষ নিবারণ হয়

পেট-ফাঁপা ঃ বসন্ত রোগীর পেট ফাঁপিলে নিম্নলিখিত যে কোনও একটি ঔষধ প্রয়োগ করিলে উপকার হয়। (১) গাঁদাফুলের পাতা একটু সোরাসহ বাটিয়া পেটে প্রলেপ দিতে হয়।

(২) কিংবা হিং গুলিয়া নাভির চারিদিকে লেপন করিতে [redacted]।
(৩) পাতিলেবুর রসে একটু শোধন করা হিং মিশাইয়া খাইলেও উপকার [redacted]

অরুচি ঃ—বসন্তে অরুচি হইলে [redacted] দাড়িমের রসের সহিত মুগের যূষ পান করিলে অরুচি নষ্ট হয়

রক্ত-ভেদ প্রভৃতি ঃ—বসন্ত রোগীর রক্তভেদ, রক্ত বমন [redacted] রক্ত প্রস্রাব হইলে মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন [redacted] কাঞ্চন বৃক্ষের ছাল এই তিনটি জিনিষের পাচন সিদ্ধ জল পান উপকারী

রক্ত মূত্রে ঃ—বসন্ত রোগীর জ্বর ও রক্তমূত্রে, পল্‌তা, ক্ষেতপাপড়া, শুঁঠ, মুথা [redacted] খদির সমাংশে লইয়া সর্ব্বশুদ্ধ দুইতোলা হইলে, তাহা জলে বাটিয়া চারি আনা আন্দাজ মধুসহ সেবন করিলে উপকার দর্শে।

ঘর্ম্মে ও গাত্র-দুর্গন্ধে ঃ—এই দুই উপসর্গ হইলে, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বেণামূল, শিরীষ ছাল, মুথা, লোধ, দেবদারু [redacted] নাগেশ্বর সমাংশে বাটিয়া প্রলেপ দিবে

কাস ও গলায় বেদনা ঃ—শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, যষ্টীমধু, তেজপত্র ও বাসক মূলের ছাল সিদ্ধ পাচন সেবন করিলে কাস ও গলার বেদনার উপশম হয়। অথবা পিপুল ও হরীতকী চূর্ণ মধুসহ লেহন করিলেও উপকার দর্শে

মুখে ও কণ্ঠে ক্ষত ঃ—মুখে [redacted] কণ্ঠে বসন্তের জন্য ক্ষত হইলে দুইতোলা আমলকী ও দুইতোলা যষ্টীমধু এক সের জলে

সিদ্ধ করিয়া একপোয়া থাকিতে নামাইয়া, সেই [redacted] ছাঁকিয়া লইয়া রোগীকে বারম্বার কুলকুচা করিতে দিবে। ইহাতে মুখ [redacted] গলার [redacted] শীঘ্র শুকাইয়া যায়।

২ আমলকী [redacted] যষ্টীমধুর কাথে একটু মধু প্রক্ষেপ দিয়া পুনঃ পুনঃ কুলকুচা করিলেও উপকার হয়।

৩ জাতীপত্র, মঞ্জিষ্ঠা, দারু হরিদ্রা, সুপারি, শমীছাল, আমলকী [redacted] যষ্টীমধুর কাথ শীতল হইলে তাহাতে চারি আনা মধু প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে মুখ [redacted] কণ্ঠের ক্ষত নিবারণ হয়।

চক্ষুতে বসন্ত হইলে :—১ গুলঞ্চ ও যষ্টীমধু জলে বাটিয়া তাহাকে পুঁটলি বদ্ধ করিয়া সেই পুঁটলি নিপীড়িত [redacted] চক্ষে দিলে চক্ষু শীতল হয়

২ যষ্টীমধু, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, দারু হরিদ্রা, নীলোৎপল, বেণামূল, লোধ ও মঞ্জিষ্ঠা প্রভৃতির মধ্যে যত গুলি দ্রব্য পাওয়া যায়, সে সমস্তকে সমাংশে গ্রহণ করিয়া শীতল [redacted] পিষ্ট করিবে চক্ষুর উপরে ইহার প্রলেপ দিলে [redacted] চক্ষুর ভিতরে ইহার [redacted] দিলে চক্ষুর বসন্ত শীঘ্র সারিয়া যায়। এবং আর নূতন বসন্ত উদ্ভিন্ন হইতে পারে না।

পুঁয-প্রাপ্তিকালে :—বসন্ত পাকিয়া পুঁয হইলে আমলা, হরীতকী ও বহেড়ার পাচন-সিদ্ধ [redacted] আধতোলা আন্দাজ শোধিত গুগ্‌গুল প্রক্ষেপ দিয়া দিবসে দুই বেলা সেবন করিলে পুঁয নির্গত হইয়া বেদনা-দাহাদি দূর হয়।

বসন্তে জল জন্মাইলেঃ—বসন্তে যদি বেশী জল জন্মায়, তাহা হইলে নিমপাতা, নাটার ডগা, আপাংপাতা, কেলে কড়ার পাতা, তুলসী পাতা [illegible] নীমে শাক—এই সকল পাতার রস সমান পরিমাণ লইয়া তাহাতে সামান্য পরিমাণে নারিকেল তৈল, আদার রস, পিয়াজের রস ও জাফরাণ মিশাইয়া বসন্তের উপরে ছোব্ লাগাইলে জল শোষণ হয়

কীট-নিবারণঃ—বসন্ত রোগীর ঘরে ধুনা, দেবদারু, শ্বেতচন্দন, অগুরু ও সরল কাষ্ঠ প্রভৃতির ধূম প্রদান করিলে বসন্তের ক্ষতে কীট জন্মাইতে পারে না

ক্ষতে চুলকানি হইলেঃ—১ বসন্তের ক্ষত চুলকাইতে থাকিলে নালিতা পাতা চূর্ণ, মসুরি চূর্ণ ও চা খড়ির গুঁড়া সমভাবে মিশাইয়া ক্ষতের উপরে সামান্য ভাবে ছড়াইয়া দিলে, অথবা সিদ্ধি, হলুদ, বিলঘুটের ছাই, নালিতা পাতা, নিমপাতা, ও শুষ্ক আম আঁটির শস্য—এই সকলের গুঁড়া সমভাবে মিশাইয়া আল্গা পুঁটলী বদ্ধ করিয়া ক্ষতের উপর থোব দিলে চুলকানি সারিয়া যায় ও ক্ষত শুষ্ক হইয়া উঠে।

ক্ষত শুকাইবার উপায়ঃ কালজীরা, রসুন, কুঙ্কুম, গাঁজা ও পোস্তর খোসা (ঢেঁড়ি) এই কয়টি জিনিষ জলে সিদ্ধ করিয়া সেই গরম জলের উষ্মা (ভাপরা) রোগীর গায়ে লাগাইলে ক্ষত শুষ্ক হয়।

২ নিমপাতা, নিসিন্দা পাতা ও বেগুণ পাতার চূর্ণ এবং মেটে-

পাথরের গুড় সমভাগে মিশাইয়া তাহা কাপড়ের পুঁটলীতে বন্ধ করিয়া ক্ষতের উপর থোব দিলে ক্ষত শীঘ্র শুষ্ক হয়।

৩। আমলা, হরীতকী, বহেড়া, যষ্টিমধু, চালমুগরার বীজ, দারু হরিদ্রা, নীলোৎপল, বেণার মূল, লোধকাঠ ও মঞ্জিষ্ঠার চূর্ণ এবং বিল ঘুঁটের ছাই সমানভাগে মিশাইয়া পাতলা কাপড়ের পুঁটলীতে ক্ষতের উপর থোব দিলে ক্ষত শীঘ্র শুষ্ক হয়।

৪। বটের ঝুরি, যজ্ঞ ডুমুরের ছাল, অশ্বত্থ ছাল, পাকুড় ছাল ও যষ্টীমধু—এই সকলের চূর্ণ সমভাগে লইয়া উপরি উক্ত প্রকারে ক্ষতে প্রদান করিলে ক্ষত শুষ্ক হয়।

পথ্যাপথ্য-নির্ণয়।

অপক্কাবস্থায়ঃ—অনেকে হাম ও বসন্ত রোগীকে 'রসস্থ' করিবার জন্য কলায়ের ডাল ও ভাতের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহাতে অনেক সময় হিতে বিপরীত হয়। রোগ উৎকট আকার ধারণ করে, কফ বৃদ্ধি হয়। এবং অতিসারও জন্মায়। প্রথমাবস্থায় রোগীকে জল-সাগু, দুধ-সাগু বা দুগ্ধপক্ক-এরারুট প্রভৃতি লঘু পথ্য দেওয়া উচিত। চারি পাঁচ দিন পরে রোগীর ক্ষুধা হইলে অতি পুরাতন ছোলার ডালের যূষ, সোণামুগ ও মসুর ডালের যূষ এবং পুরাতন যবের মণ্ড রোগীকে খাওয়ান চলে এই সঙ্গে পলতা, পটোল, উচ্ছে, কাঁচকলা, কাকরোল ও সজিনার ডাঁটা প্রভৃতির ব্যঞ্জন এবং ডালিম, বেদানা, আঙুর ও কেশুর

প্রভৃতি ফল দিতে পারা যায়। রোগের পচ্যমানাবস্থায় দেহে বল-রক্ষার জন্য রোগীকে মধ্যে মধ্যে ঘুঘু, চড়াই পাখী, কপোত ও ডাক-পাখীর যূষ খাওয়ান ভাল

পক্কাবস্থায়ঃ—উপরি-উক্ত পথ্যের ব্যবস্থা এক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তাহার উপর সূক্ষ্ম দাউদখানি চাউলের অন্ন, জাঙ্গল মাংসের যূষ, ঘৃতাক্ত ব্যঞ্জনাদি এবং পানিফল, খেজুর, পিয়ারা, আপেল ও শাঁখআলু প্রভৃতি ফল সুপথ্য।

ক্ষত শুষ্ক সময়েঃ—বসন্তের ক্ষত শুকাইবার সময় রোগীকে শুক্রজনক ও বলকর পথ্য প্রদান করা উচিত। এ সময়ে সোণামুগের পাতলা খিচুড়ী, মসুর ও মাংসের যূষ এবং মানকচু, মুলা ডুমুর, পল্‌তা ও বেগুন প্রভৃতির ঝোল ও ব্যঞ্জন ব্যবস্থা-যোগ্য।

অপথ্য—

যে সমস্ত দ্রব্যে বায়ু বৃদ্ধি হয়, এবং যাহা রুক্ষ, তাহা বর্জ্জনীয়। দূষিত জলপান, বিরুদ্ধ ভোজন, গুরুপাক দ্রব্য ভোজন, শীম, শাক, সুরা, আমানি, লঙ্কার ঝাল, অম্ল ও অতি লবণাক্ত দ্রব্য একেবারে নিষিদ্ধ। অতিরিক্ত জল-পানও ভাল নহে।

রোগীর পালনীয় বিধি।

রোগী নির্ব্বাত গৃহে বাস করিবে। কোমল শয্যায় ঘৃতাক্ত পত্রাদির উপর শুইবে শয্যা যেন অধিক উচ্চ বা নিতান্ত

ভূমি-সমান না হয়। রোগীর গায়ে যেন সর্ব্বদা একটা আচ্ছাদন থাকে নির্জ্জনে বা বহু জনাকীর্ণ গৃহে রোগীকে রাখা উচিত নহে। কচি নিম পাতার চামর করিয়া তাহার দ্বারা রোগীকে হাওয়া দিতে হয় রোগীর বস্ত্র ও শয্যা যত বেশী পরিবর্ত্তন করা যায়, ততইভাল অধিক ঔষধ-প্রয়োগ নিষিদ্ধ স্ত্রী লোক ও নীচ লোকের সংসর্গ ও প্রসঙ্গ একেবারে বর্জ্জন করা প্রয়োজন পরিশ্রম, চিন্তা, দিবা নিদ্রা, তেল-মর্দ্দনাদি, অগ্নির উত্তাপ, রৌদ্র উপভোগ এবং শোক ও কোপ প্রকাশ পরিহার করা রোগীর পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য। মল-মূত্রের বেগ ধারণ অনুচিত রোগীকে কথনও ভয় প্রদর্শন বা শাসন করিবে না ধুপ, ধুনা ও গুগ্‌গুল প্রভৃতির দ্বারা রোগীর গৃহ সর্ব্বদা সুগন্ধান্বিত করিয়া রাখা প্রয়োজন বিকারাবস্থায় বসন্ত পাকিয়া উঠিলে কাঁটা দিয়া বসন্তের স্ফোটক গালিয়া না দিয়া একটু মৃগনাভি ঘিয়ে ভাজিয়া সেই ঘি স্ফোটকে প্রদান করিবে বসন্তের ঘা নিম-ছালের কাথে ধুইবে নিমছালের চূর্ণ ঘায়ে দিবে বসন্তের শেষ সময়ে পূঁয, শোণিত ও শুষ্ক ত্বকের লোভে পিপীলিকার উপদ্রব বাড়ে। হরিদ্রাচূর্ণ ছড়াইলে ইহাদের উপদ্রব দূর হয়। রোগীর গৃহ সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখিবে রোগীর শয্যায় ও খাদ্য-দ্রব্যে কর্পূর ব্যবহার্য্য। শম্বুকের গর্ভস্থিত জল রোগীর চক্ষে দিবে ও রোগীকে পান করিতে দিবে ইহার উপ-কারিতা অসামান্য। রোগীর চক্ষু নষ্ট হইবার ভয় থাকে না রোগীর গৃহের চারিদিকে নিমপাতা রাখিবে। কোনও উচ্ছিষ্ট দ্রব্য গৃহে প্রবেশ করিতে দিবে না।

শীতলা পূজার ব্যবস্থা করিবে নিত্য শীতলা-স্তোত্র পাঠ করিতে হয়

গৃহস্থের কর্ত্তব্য

১। বাটীতে কাহারও বসন্তরোগ হইলে সেই বাটীর সকলেই শুদ্ধাচারে থাকিবেন নিত্য পরিষ্কার শুভ্র বস্ত্র পরিধান করিবেন

২ বসন্ত রোগীর উচ্ছিষ্ট বা সংস্পৃষ্ট দ্রব্য কেহ ভক্ষণ করিবেন না।

৩ বসন্ত রোগীর বস্ত্র দীঘি বা পুকুরে না কাচিয়া বাটীতে প্রত্যহ সাবান দিয়া ধুইতে হয় বাড়ীর অন্যান্য সকলের কাপড়-জামা দীঘি বা পুকুরে কাচিলে ক্ষতি নাই তবে যতদিন না রোগী আরোগ্যলাভ করে, ততদিন ধোপার বাড়ীতে কাহারও বস্ত্রাদি পাঠাইতে নাই

৪ রোগীর শুশ্রূষাকারীরা ঘৃতপক্ব দ্রব্য আহার করিবেন গুরুপাক দ্রব্য খাইবেন না মৎস্য ও তৈল ইঁহাদের বর্জ্জন করাই উচিত। বাটীতে মৎস্য আনিতে দিবেন না।

৫। কেহ কাহাকেও রোগ-আক্রমণ সম্বন্ধে ভয়পূর্ণ কথা বলিয়া কাহারও মনে ভীতি-উৎপাদন করিবেন না বরং মনে যাহাতে সাহস হয়, এইরূপ কথাই পরস্পর পরস্পরকে বলা উচিত

৬ শুশ্রূষাকারী ব্যতীত আর কেহ রোগীর ঘরে রাত্রি-বাস করিবেন না